Lakkho লক্ষ্য লক্ষ্য

ছাত্রীদের বার্ষিক পত্রিকা

২০২০-২১

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন
৩৯ শংকর ঘোষ লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬

লক্ষ্য / *Lakkho* / লক্ষ্য

ছাত্রীদের বার্ষিক পত্রিকা

২০২০-২১

সম্পাদনা

অধ্যাপিকা কেকা দাস

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন

৩৯ শংকর ঘোষ লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬

দূরভাষ : ২২৪১ ৮৮৮৯

লক্ষ্য / Lakkho / लक्ष्य

Annual Students' Magazine, 2020-21

সম্পাদনা : **অধ্যাপিকা কেকা দাস**

প্রকাশ : মার্চ, ২০২১

উপদেষ্টামণ্ডলী
ড. মলি ঘোষ
ড. সম্পা বর্মণ
ড. আসিফ আলম
ড. রাজু তামাং
শ্রী গণেশ হেমব্রম
শ্রী অর্ণব কয়াল

তৃপ্তি যশ
সাধারণ সম্পাদক, ছাত্রী সংসদ

প্রকাশক
বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন
৩৯, শংকর ঘোষ লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ রূপায়ণ
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

মুদ্রক
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ২৩৫০ ০৮১৬/২৩৬০ ৪৮৭৯

বিদ্যাসাগর প্রশস্তিঃ

প্রজ্ঞয়নোজ্জ্বলা বুদ্ধিঃ বিদ্যায়াং সাগরোপমঃ।
কারুণ্যে চ যথা বুদ্ধঃ সর্বেষু মৈত্রভাবনা॥
যত্নো যস্য সদৈবাসীদ্ দীনদুঃখবিমোচনে।
সর্বেষামার্তিনাশায় মাতা স্নেহময়ী যথা॥
চারিত্র্যানি সদৈবাস্য মহাপুরুষবাদ ভুবি।
বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি॥
এবম্ সর্বগুণোপেত ঈশ্বরীয় বিভূতিমান্।
ভারতীয়জনানং হি পুন্যরূপং বিরাজতাম॥

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

VIDYASAGAR COLLEGE FOR WOMEN

(NAAC ACCREDITED)

39 SANKAR GHOSH LANE &
8A, SHIBNARAYAN DAS LANE
KOLKATA-700 006
Phone : 2241 8889
E-mail : office.vcfw@gmail.com
office@vcfw.org

No..... *Date .....*

শুভেচ্ছা বার্তা

আমাদের কলেজের ছাত্রীদের পত্রিকা প্রকাশ হতে চলেছে, এ আমার কাছে খুবই আনন্দের খবর। আমি চাই তারা সৃজনশীল লেখা আরও লিখুক, ছবি আঁকুক। তা দিয়ে ভরিয়ে দিক তাদেরই পত্রিকা। সিলেবাসের লেখাপড়ার সাথে সাথে তৈরি হোক সৃজনশীল জগৎ। যে জগতকে বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন যত্ন করে আগলে রাখবে।

আমার প্রিয় ছাত্রীদের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে—

R Chandhuri

অধ্যক্ষা

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন

Students' Magazine : I. Q. A. C. সমন্বয়কারীর কলমে

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন-এর ছাত্রীদের পত্রিকা 'লক্ষ্য' বহু প্রতীক্ষার অবসানে এক নতুন রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। আজ 'লক্ষ্য' ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে। জ্ঞানের ব্যাপ্তি আদান-প্রদানে, নব সৃষ্টিতে। আমাদের ছাত্রীদের আগ্রহ, উৎসাহ, সৃষ্টিসুখের আনন্দ প্রকৃতপক্ষেই তুলনাহীন। অতি স্বল্প সময়ে তারা যে অসামান্য সৃষ্টি সুধার তাদের লেখনীতে, তাদের অঙ্কনে বারিবর্ষণ করেছে, তাতে আমরা সত্যিই অভিভূত। ছাত্রীদের এই পত্রিকায় ছোট গল্প, কবিতা, আঁকা ছাড়াও এই বছরে ছাত্রী সংসদ দ্বারা আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কিছু ঝলক রয়েছে। আশা রাখি বর্তমান সংখ্যার ন্যায় ভবিষ্যৎ সংখ্যাগুলিতেও আমরা ছাত্রীদের এইভাবেই সঙ্গে পাব। সর্বশেষ আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সকল শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রীদের যাদের নিরলস পরিশ্রমের ফল এই পত্রিকা। লক্ষ্যে অবিচল থাকার লক্ষ্য থেকে যেন আমরা কখনও বিচ্যুত না হই।

ডঃ তপন রায়

সম্পাদিকার কলমে

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নিবারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভয় শূন্য, উচ্চ শিরে আমাদের ছাত্রীরা তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে তুলনাহীন কিছু শিল্পকর্মের সৃষ্টি করেছে। গতানুগতিক জীবন ও তার গণ্ডির যাঁতাকলে আজ ছাত্র-ছাত্রীদের মন ভ্রান্ত, ক্লান্ত; আজ তাদের মন দু-দণ্ড মানসিক শান্তির আশায় হন্যে হয়ে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ায়, এইরকম পরিশ্রান্ত মনকে আশার আলো দেখায় আমাদের সবার 'লক্ষ্য'। লক্ষ্য, যা 'বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন' এর ছাত্রীদের বার্ষিক পত্রিকা, আজ স্বমহিমায় তার দীর্ঘদিনের যাত্রার পরিসর বয়ে নিয়ে চলেছে। ছাত্রীরা কখনও তাদের শৈল্পিক মননের সৃষ্টি, কখনও কোন অভিজ্ঞতা বা কখনও কোন বাস্তব ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরেছে তাদের জানার পরিসর শুধুমাত্র সিলেবাস কেন্দ্রীক নয়,তারা আরও অনেক কিছু জানতে চায়, জানাতে চায়, জ্ঞানে আদান-প্রদানে তাদের জ্ঞান-পিপাসু সত্ত্বা স্বগৌরবে গৌরবোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অদেখা কে দেখার, অজানাকে জানার ও জানানোর এই উদ্যোগকে বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন সর্বদা কুর্নিশ জানায় ও আশা রাখে যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সংখ্যায় সৃজনশীল মনের জয়যাত্রা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। বর্তমান সংখ্যায় যে সকল ছাত্রীরা তাদের সৃষ্টি তুলে ধরেছে, তাদের অসংখ্য অভিনন্দন। আশা রাখি যে আগামী সংখ্যায় আমরা আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রীর থেকে সৃষ্টি সুধা লাভ করব। এক্ষেত্রে অবশ্য বলা বাঞ্ছনীয় যে ছাত্রীদের এই বার্ষিক পত্রিকা তার গৌরবোজ্জ্বল যাত্রা বজায় রাখতে পেরেছে কিছু সংখ্যক মানুষের বদান্যতায় ও প্রেরণায়। ছাত্রী সংসদের বিশেষ পত্রিকা 'লক্ষ্য'-র সঙ্গে যুক্ত সমস্ত শিক্ষিকার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি মহাশয়কে, মাননীয়া অধ্যাক্ষ মহাশয়াকে, মাননীয় I.Q.A.C সমন্বয়কারী মহাশয়কে, মাননীয়া ছাত্রীসংসদের সভাপতি মহাশয়াকে এবং যে সকল শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের যাদের সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা আমাদের পাথেয়।

ধন্যবাদ—

অধ্যাপিকা কেকা দাস

সূচিপত্র

সম্পাদিকার কলমে		07
সমাজ গঠনে মহিলাদের ভূমিকা	সহেলী বিশ্বাস	11
কৃষ্ণকলি	শ্রুতি পাঠক	15
লক্ষ্মী	পূজা দাস	18
একটি মেয়ে	পূজা দাস	18
বিচ্ছিন্নতা	পূজা দাস	18
প্রযুক্তির চোখরাঙ্গানীতে, অকালমৃত্যু কল্পনার	সুশ্রিতা মুখার্জী	19
'পাই নে তোমারে'	দেবিকা সাহা	20
যান্ত্রিক শৈশব	দেবরূপা ঘোষ	22
আধুনিকতা	কৌশিকী মুখার্জী	23
दबा रह गया...	नीतू कुमारी	25
गुजरी कहानी	नीतू कुमारी	25
Article on Child Labour	Shalini Dutta	26
Article on Women Empowerment	Rajstuti Mitra	27
Imagination And Literature	Sayantika Mukherjee	29
The Youth of Today is the Drawing Force of Tomorrow	Rajstuti Mitra	31
Pendulum	Urmila Ganguly	33
Creative Bower		36
Pencil Sketch		39

সমাজ গঠনে মহিলাদের ভূমিকা

সহেলী বিশ্বাস
বি. এ. প্রথম বর্ষ

''সাম্যের গান গাই -
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই
বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর''
—কাজী নজরুল ইসলাম (নারী)

নজরুল ইসলামের মতো এই মহান ভাবনা যদি আজীবন কাল ধরে চলে আসত তাহলে নারীদের অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের এতটা লড়াই করতে হত না। উনিশ শতকের সূচনাকালে বাঙালি মেয়েদের অবস্থা গর্ব করার মতো ছিল না। শিক্ষার আলোক বঞ্চিত, বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বাঙালি-র নারীরা প্রায় সমস্ত অধিকার থেকে ছিলেন বঞ্চিত। বিশ্ববিধাতা সৃষ্ট প্রাণীকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ খুব স্বাভাবিকভাবেই দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করে দেয়, জাতপাতেরও ঊর্দ্ধে ওঠে — পুরুষ ও নারী। পুরুষেরা সমাজ পরিচালনা করে এবং নারীরা হয়ে ওঠে শুধুমাত্র বংশবৃদ্ধি করা ও ঘরকন্নার কাজ সামলানোর প্রধান হাতিয়ার। তাদের থাকতে হয় শুধু অন্দরমহলে। বুকফুলিয়ে গর্ব করে পুরুষেরা বলে নারীদের হতে হয় নাকি অসূর্যম্পশ্যা, না হলে বংশের সম্মান থাকে না আর নারীর সতীত্ব বজায় থাকে না। এই সতীত্ব নামক অদৃশ্য বস্তুটির মাধ্যমেই বেঁধে রাখে নারীদের। পুরুষদের নাকি সতীত্ব বা চারিত্রিক বিশুদ্ধতা রক্ষায় দায়িত্ব থাকে না। থাকে শুধু নারীদের। আর সেটাই ছিল নারী স্বাধীনতার পক্ষে প্রধান অন্তরায়। আমাদের হিন্দু সমাজের প্রধান মহাকাব্যেই নারীর সতীত্বের পরীক্ষার উল্লেখ আছে। সমাজের কথা ভেবে, কুলের মান রক্ষার্থে রাজা রাম রাবণের অধীনে থাকা সীতার অগ্নিপরীক্ষা নেন, তবে সতীর নিজের দিক থেকে কিছু বলার অবকাশ রাখেন না, সেই দিন থেকে বর্তমান আধুনিক সমাজে শুধু মেয়েরাই দেয় অগ্নিপরীক্ষা, তবে তার দিক ও কারণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে। সতীত্বকে রক্ষা করার দায় শুধু কি মেয়েদেরই? পুরুষদের কি কর্তব্য থাকে না সেটাকে সম্মান দেবার? একটা কুলীন ব্রাহ্মণ শুধুমাত্র জাতের দোহাই দিয়ে শত বিবাহ করতে পারে কিন্তু একজন বিবাহিতা নারী কোনো অন্য পুরুষের দিকে তাকালে বা তার কথা কল্পনা করলেও সেটা তার ক্ষেত্রে পাপ হবে।

''নারী কি শুধু নরের ভোগ্য?
নহে কি জননী, নহে কি ভগিনী
নহে কি বিশ্বহিতের যোগ্য''

সমাজে নারীর ভূমিকা এবং পরিচয় বহু, কখনও সে মেয়ে কখনও ভগিনী, কখনও পত্নী, কখনও মাতা, কখনও বধূ, কখনও বা শাশুড়ি, তার কাজের ভারে নিজের সত্ত্বাকেই সে হারিয়ে ফেলে। মেয়েদের বেঁচে থাকাটাই ছিল স্বামীর মুখ চেয়ে। সে যোগ্য হোক, অযোগ্য হোক, উপার্জন করুক বা না করুক স্বামীর সোহাগই তাঁদের একমাত্র প্রার্থনা।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সব নারী ব্যক্তিত্ব সামাজিক অগ্রগতিতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন তাদের কথা বিশ্লেষণ করতে হলে একদম প্রথম থেকে শুরু করা উচিত। প্রাচীন যুগে কিছু শিক্ষিতা নারী ব্যক্তিত্বের কথা আমরা জানি। ভারতের প্রথম মহিলাগুরু — গার্গী। এছাড়াও অন্যান্যরা হলেন অপালা, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি। তারা বিভিন্ন পুরাণ, মহাকাব্য ও শাস্ত্র পড়ে হয়ে উঠেছিলেন সম্পূর্ণ শিক্ষিতা। তবে নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হ্রাস টানা হয়ে থাকে মধ্যযুগে থেকে।

কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ গড়ে ওঠার পর তারা বোঝেন নারীরা শুধুমাত্র সমান নয়, তারা পুরুষদের ছাপিয়ে যাবারও ক্ষমতা রাখে। তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন কিছুজন নারীর উল্লেখ পাই যারা স্বয়ং এবং কিছুজন মাতারূপে সন্তানদের মাধ্যমে সমাজকে সচেতন করার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হন। এঁরা ইতিহাসে আজও চিরস্মরণীয়।

ডিগ্রিধারী শিক্ষিতা না হয়েও কিছু কিছু মহিলা আত্মজ্ঞানের দীপ্তিতে দীপ্তিময়ী ছিলেন, তাদের মধ্যে প্রধান হলেন — ভগবতী দেবী। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতা। ছেলের পরিচয়েই আজও চিরস্মরণীয়।

তবে তার সম্পর্কে জানেন খুব কমজনই। ঈশ্বরচন্দ্রকে তিনি একজন চরিত্রবান, গুণবান, বিদ্বান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই জীবনের শেষ বয়স পর্যন্ত বিশ্বাস করতেন বিদ্যা ও চরিত্র না থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ হয় না। মায়ের এই শিক্ষা তিনি আজীবন মনে রেখে ছিলেন এবং লড়াই করেছিলেন সমাজের একটি অতি জঘন্যতম প্রথা বহু বিবাহের বিরুদ্ধে। মহিলাদের তিনি শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন সন্তান তার প্রথম ও প্রকৃত শিক্ষা পায় তার মায়ের কাছে। যদি স্ত্রী শিক্ষার প্রসার না ঘটানো হয় তাহলে প্রতিটি বঙ্গসন্তান ধারাবাহিকভাবে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকবে। দেশের যুবসমাজের বিনাশ ঘটবে। সমাজ গঠনে পরোক্ষভাবে মহিলাদের বিরাট বড়ো ভূমিকা আছে তা তিনি জানতেন। মায়ের মমতা, স্নেহ, করুণা, দয়া, মায়াই মায়ের প্রতি তার ভালোবাসাকে বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ, তাই ভারতবাসীর কাছে তিনি 'করুণার সাগর' বা 'দয়ার সাগর' নাম পরিচিত।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের বিশাল জ্যোতিষ্ক সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রে পিছনে ছিল তাঁর মা প্রভাবতী দেবীর অবদান। ধর্মপরায়না এই মহিলার চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল অসামান্য। সেই দৃঢ়তা পরবর্তীকালে আসে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে। সামান্য গৃহিনীর এই হৃদয়দৃঢ়তা তৈরী করে স্বাধীনতা সংগ্রামীকে। অন্তর মহলে হেঁসেল সামলানো এই মহিলা তৈরী করেছিলেন এই উজ্জ্বল নক্ষত্র যার মাধ্যমে আলোকিত হয় গোটা ভারতবর্ষ এবং প্রভাবিত হয় লক্ষ লক্ষ যুবক।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী একজন ভারতীয় পণ্ডিত ও প্রথম হিন্দু জাতীয়তাবাদী, তবে তার কিংবদন্তী তুল্য পাণ্ডিত্য ও ঐকান্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা ও ধারণার জন্য দায়ী ছিলেন তার মাতা যোগমায়া দেবী। উত্তরাধিকার সূত্রে মায়ের কাছে তিনি এই শিক্ষালাভ করেন, এবং এই শিক্ষা তাকে অনেকদূর পর্যন্ত নিয়ে যায়। তিনিই প্রথম কনিষ্ঠতম উপাচার্য ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের।

যাকে জানলে সমগ্র ভারতবর্ষকে জানা যাবে তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন অসামান্যা মহিলা। রূপের ও গুনের সীমা ছিল না। ছিল এক অদ্ভুত স্মরণশক্তি যা পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের মধ্যেও প্রকাশিত হয়। রামায়ণ, মহাভারত ছিল মুখস্থ। কিছু কিছু ইংরাজীও জানতেন, বালকের প্রথম শিক্ষা তার মায়ের থেকেই। পুরাণের কাহিনি পড়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সবটা জানতে চাওয়া আগ্রহী ছোট ছেলেটিকে তৈরী করল এক মহান পুরুষ। অন্দরমহলে দিনযাপন করলেও ভুবনেশ্বরী দেবীর ছিল দারুন ব্যক্তিত্ব যা পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয় বিবেকানন্দের মাধ্যমে। উজ্জ্বল বর্ণ, দীপ্ত চোখ, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এই প্রাণটিকে গঠন করার পিছনে ছিল তার অবদান।

ডিগ্রিধারী না হয়েও তাঁরা ত্যাগ, নিষ্ঠা, সততা, ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে তৈরী করেন একেকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। এছাড়া এমন কিছু মহিলাদের অবদান আছে, যারা বিবাহিতা বা কুমারী থেকেও বুঝিয়ে ছিলেন তারা পুরুষের সঙ্গে কতটা সমান। সমাজের বাধা, কটূক্তি সহ্য করেও তারা স্ত্রী প্রগতির জন্য লড়াই করেন।

রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর গুরুভাইদের, স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দকে যিনি সামলে ছিলেন তিনি হলেন মাতা সারদাদেবী। কেউই তার নিজের সন্তান ছিল না, তবুও তিনি একজন দায়িত্ববান, নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়না মায়ের ভূমিকা পালন করেন। স্বামী বিবেকানন্দ নিজে উত্তরসূরী হিসেবে নিয়ে এসেছিলেন নিবেদিতাকে। ভগিনীরূপে সম্বোধন করেন তাকে। মাতা সারদার দৃঢ়ছায়ায় তিনি সন্তানসম স্নেহ, মমতাকে অনুভব করতে পারেন। সেই থেকে সমাজ সংস্কারের ও মেয়েদের শিক্ষার কথা ভাবেন তিনি এবং প্রতিষ্ঠা করেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়' পরে যার নাম হয়—রামকৃষ্ণ

সারদা মিশন ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় বা ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়।

রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম ভূস্বামী কন্যা ছিলেন বেগম রোকেয়া। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা অনুসারে বাইরে পড়াশোনা করেননি তিনি, বাড়িতে শেখা হলেও তা বন্ধ হয়ে যায় অচিরেই। বিবাহের পর তার আগ্রহ দেখে স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন তাঁকে পড়ান। নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি তৈরী করেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। কারণ তিনি জানতেন পরিবারে প্রধান ভূমিকা পালন করে মহিলারই। তাই নারী শিক্ষা একান্ত জরুরী।

শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম ও বাণিজ্য এবং সমাজ সংস্কারের প্রায় সব দিক থেকেই উদার ও সফল পরিচয় দেওয়া জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দুই মহিলার কথা। প্রথমজন হলেন— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। সিভিলিয়ান অফিসার স্বামী বিলেত থেকে এসে স্ত্রীকে বের করেন অন্দরমহলের বেড়াজাল ভেঙে। বাড়ির মেয়েদের পোষাকের প্রতিও কঠোর দৃষ্টি ছিল জ্ঞানদার। তাই পার্সি ঢঙে 'বোম্বাই দস্তুর' স্বামীর পাশাপাশি থেকে তিনি যোগ্য সহধর্মিনী হয়ে উঠেছিলেন, তার স্বপ্ন ছিল তার মতো সমস্ত বাঙালি মেয়ে বউরা এই ধরনের কাপড় পরে জনসমক্ষে বের হবে। স্বামীর পাশে দাঁড়াবে গর্ব করে। তিনিই ছিলেন প্রথম বাঙালি মহিলা যিনি লাটভবন যান। লজ্জায় অনেক গোঁড়া হিন্দু বাঙালির মাথা কাটা গেলেও জ্ঞানদার বা সত্যেন্দ্রনাথের কোনো রকম লজ্জাবোধ হয়নি। তার ব্যক্তিত্ব দেখেই হয়তো ঠাকুরবাড়ি থেকে শুরু করে সম্ভ্রান্ত সমাজের রমণীরা আদায় করতে থাকেন নিজেদের অধিকার। ঠাকুরবাড়িতে তার গুণমুগ্ধা ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। যিনি শত প্রতিকূলতা জয় করে দাদাদের সঙ্গে বীর দর্পে গিয়েছিলেন কবিতার আসরে। তার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন বহু শ্রোতা ও লেখক। তিনিই প্রথম বাঙালি লেখিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন জনসমক্ষে এবং তার লেখনীর বাঁধুনী ছিল খুবই শক্ত। তাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু বাঙালি কন্যা নিজেদেরই লেখিকা সত্তাটিকে জাহির করবার সাহস পান। মহিলাদের লেখবার স্বাধীনতার জন্য তিনিও বহু লেখালেখি করেছেন।

অপার স্নেহময়ী, উদার করুণাময়ী রানি রাসমনি, যিনি স্বামী মৃত্যুর পর একা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে জমিদারী চালান, দেবতার ও ধর্মের প্রতি ভাবাবেগ ছিল প্রবল তবুও তথাকথিত ব্রাহ্মণ ও হিন্দুদের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারগুলি পাত্তা দেননি তিনি। নিজের সন্তানের মতো দেখতেন জামাই মথুরকে এবং তার সাহায্যেই তৈরী হয় গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির। ১৮৫৪ সালে করলেন সেই বিখ্যাত কালীমন্দির। খরচ পড়ল সব মিলিয়ে প্রায় ন'লক্ষ টাকার মতো। রাসমণির উদারতার জন্য সর্বসাধারণ মানুষ পায় মায়ের দর্শন। নীচু জাতের মেয়ের মন্দির বলে বহু কথা শুনতে হয়েছিল তবুও তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। মহিলাদের অবাধভাবে গঙ্গাস্নানের জন্য তিনি বাঁধানো ঘাট বানান, জাতীয় গ্রন্থগারের জন্য বহু অর্থ দেন। নিজের দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে বেঁধেছিলেন তার পরিবারকে। তার স্নেহ ও অন্নে লালিত হত বহু অনাথ, দুঃখী। সকলের কাছে তিনি ছিলেন 'রানি মা'। সাধারণ মেয়ে থেকে সকলের রানিমা হয়ে ওঠার পথটি সমাজের বাকি সব মহিলার কাছে হয়ে ওঠে অনুপ্রেরণা।

এছাড়াও ভারতবর্ষের ইতিহাসে আছে বহু নারীচরিত্র যারা অন্দরে থেকেও জননী হয়েও সৃষ্টি করেছেন এক নতুন ইতিহাস, নারী জাগরণের এক নতুন অধ্যায়। স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেই নেমেছেন ঢাল হাতে তার যোগ্য উদাহরণ হল— ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ। পুরুষের মতো দৃপ্তভঙ্গিমায় যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়েছেন তার প্রতিভা।

তবে বর্তমান সমাজে আমাদের চারপাশে যে অস্থিরতা, অনৈতিকতা, বিশৃঙ্খলতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে নারী স্বাধীনতার থেকে নারী নিরাপত্তার প্রশ্নটাই প্রধান হয়ে ওঠে। মা, কুমারী মেয়ে বা বৌমা রূপধারী নারীদের ওপর যে ধরণের অত্যাচার হয়ে চলেছে তার প্রধান প্রতিবাদ হিসেবে আসে রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের নাম। কোনো অন্যায়কে দমন

করতে হলে বা প্রতিবাদ করতে হলে শক্তহাতে দমন করতে হবে। একমাত্র নারীরাই পারে কখনও দুর্গা, কখনও চণ্ডী আবার কখনও বা লক্ষ্মীর রূপ নিতে। মাতা, স্ত্রী, ভগিনী, বৌমা বা কন্যারূপে একটা গোটা পরিবারকে সামলানোর দায়িত্ব থাকে শুধুমাত্র মেয়ের ওপর, পরিবারে দুর্ঘটনা ঘটলে নারীরাই সবথেকে বেশি ত্যাগ স্বীকার করে, আবার পুত্রের মোহে ও ভালোবাসায় অন্ধ কোনো নারীই নিজের কন্যা সন্তানকে সামনে রেখে বড়ো মাছের টুকরো বা মাংসের টুকরোটা তুলে দেয় পুত্রের পাতে। নারীরাই নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করে ভেদাভেদ তাই পুরুষশাসিত সমাজ তাতে ভাঙন ধরাতে পারে। কখনও আবার নারীরাই সবথেকে বেশি পরিমাণে স্বামী বা পুত্রের কথা অনুযায়ী চলতে থাকে। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য যদি কিছু থেকে থাকে তা হল নারী। কোনো কবি বা লেখক নিজের লেখনীর নিচে নিজের নাম লেখেন কিংবা কোনো চিত্রশিল্পী নিজের আঁকার নীচে স্বাক্ষর করেন কিন্তু একমাত্র নারীরাই সন্তান ভূমিষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে পিতার নাম দেন। সমাজে আজও যার পিতার পরিচয় নেই তার পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে বহু কষ্ট করতে হয়। ছেলে সন্তান হলে নারীরাই মুখমিষ্টি করায় আবার মেয়ে সন্তান হলে নারীরাই দেয় গঞ্জনা। নারীদের উচিত অন্য একজন নারীর বিপদে পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। কারণ সন্তানকে মানুষ করবার দায়িত্ব যে তার, তবে ডিগ্রিধারণকালে সন্তানের অভিভাবক আজও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে আসছে তাদের পিতা। তাই মহিয়সী নারীদের জীবনকাহিনী পাঠ করে নিজের আগুনে জ্বলে ওঠার আশা রয়েছে সকল নারীর কাছে।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। বঙ্গনারীর গল্প শতক
২। বন্ধু বিবেকানন্দ : শঙ্করীপ্রসাদ বসু
৩। নিবেদিতা লোকমাতা ১ম খণ্ড : শঙ্করীপ্রসাদ বসু
৪। পুরাতনী : জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
৫। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল : চিত্রদেব
৬। শ্রীরামকৃষ্ণ নারীর প্রথম পূজারী : রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা তথ্য)
৭। উইকিপিডিয়া

সম্প্রীতা ব্যানার্জী

কৃষ্ণকলি

শ্রুতি পাঠক

শ্রেণি : দ্বিতীয় বর্ষ, বিভাগ : বিজ্ঞান বিভাগ (সাধারণ)

ক্রমিক সংখ্যা : ৩৩২

দেওয়াল ঘড়ির কাঁটা জানিয়ে দিয়ে গেল রাত ১০টা। পৌষের রাত, তালবাগান থানায় ইন্সপেক্টর রাজীব চৌধুরি ও কয়েকজন কনস্টেবল। গত দু-এক সপ্তাহ কোন নতুন কাজ না আসায় ইন্সপেক্টর চৌধুরির মধ্যেও কোন ব্যস্ততা নেই।

রাত ১০টা ২৫। এমনিতেই এ অঞ্চলে তেমন কোন লোক যায় না এত রাত তার ওপর শীতের রাত। শীতটা একটু বেশিই পড়েছে। বেশিরভাগ মানুষই লেপ-কম্বলের তলায় আশ্রয় নিয়েছে একটু গরমের খোঁজে। হঠাৎই যেমন রূপকথার রাজপুত্র এসে টেলিফোন রাজকন্যার গায়ে সোনার কাঠি-রূপার কাঠি ছুঁয়ে গেল। নিশ্চুপ ফোনটা সজীব হয়ে ক্রিং...ক্রিং... করে চেঁচিয়ে উঠল। ফোনের ওপার থেকে ভেসে এল একটা ঘ্যাঁস ঘ্যাঁসে কণ্ঠস্বর — তালবাগান থানা?

— হ্যাঁ, ইন্সপেক্টর রাজীব চৌধুরি বলছি।

— মানিকদত্ত সরণিতে একটা বাড়িতে আগুন লেগেছে, দমকল নিয়ে আসুন।

— বাড়ির নম্বরটা। হ্যালো! বাড়ির নম্বরটা কত?

লাইনটা কেটে গেল, থানায় উপস্থিত দু-চারজন পুলিশকে নিয়ে জীপে করে রওনা দিল রাজীব চৌধুরি।

কিছুদূর যাওয়ার পরই দুম করে দুটো গাড়ীর সঙ্গে দেখা, তাদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে, তাদের কাছেও একই ধরনের ফোন গেছে এবং বলা হয়েছে পুলিশকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। কিন্তু সেখানেও বাড়ীর নম্বর জানার আগেই ফোন কেটে গেছে।

নীরব রাস্তার মধ্যে দিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে তিনটে গাড়ি। বোধহয় পূর্ণিমা। তাই আকাশের চাঁদটা প্রায় গোল থালারমতো। দূর থেকে রাস্তাটাকে মনে হচ্ছে একটা খোলা তরোয়াল। চাঁদের আলোয় রাস্তাটা যেন নিজের লাবণ্যর সঙ্গে প্রকাশ করছে এক দারুণ ঔদ্ধত্য।

তালবাগান থানা থেকে মানিক দত্ত সরণি গাড়িতে পনেরো মিনিটের পথ। সেখানে পুলিশের জীপ ঢুকতেই চার পাঁচজন দেখিয়ে দিলে বাড়িটা। দোতলা বাড়ি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বাড়ির মানুষরা অবস্থাপন্ন। বাড়ির চারপাশে বেশ খানিকটা ফাঁকা জমি। আরও দু-চারপা এগিয়ে গেলে পরপর বাড়ি রয়েছে। প্রতিটি বাড়িতেই লাইট জ্বলছে। একে শীতের অলসতা অন্যদিকে ভয়ংকর ঘটনা—এই দুইয়ের প্রভাবে সেখানকার বাসিন্দারা কিছুটা বিচলিত। দোতলা বাড়ির পাশেই রয়েছে আরও দুটো ঘর। তবে সেগুলো পাকা নয়, আগুনের শিখা সেই ঘর দুটোতেই আগে থাবা বসিয়েছে। পাড়ার বাসিন্দারাই আগুন প্রায় নিভিয়ে ফেলেছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়ার পর ধোঁয়া আকাশের দিকে চলেছে। দমকলের গাড়ি এসে বাকি আগুন নেভানোর কাজে লেগেছে। দোতলা বাড়ির কিছুই ক্ষতি হয়নি। শুধু দেওয়ালগুলো কালো হয়ে গেছে। বাসিন্দাদের কাছ থেকে জানা গেল, ওই অগ্নিদগ্ধ কাঁচা বাড়ি দুটোর একটিতে একটি মেয়ে ছিল, আগুন লাগার পর তাকে বাইরে আসতে দেখা যায়নি। সবার ধারণা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে তাই প্রাণ বাঁচানোর শেষ চেষ্টাও করতে পারেনি।

সাত-আট মিনিটের মধ্যেই সব আগুন নিভে গেল। এত শীতের রাতেও চারপাশের আবহাওয়া উত্তপ্ত। আগুন

নিভতেই বাড়ির লোকজন কান্নাকাটি শুরু করল মেয়েটির জন্য। ইন্সপেক্টর চৌধুরি এটুকু জানতে পারল যে, মেয়েটার নাম কলি। বয়স ঊনিশ-কুড়ি হবে। কলিরা মা আট মাস আগে মারা গেছেন। তাই, ওই ঘরে কলি একাই থাকত।

সত্যিই মানুষ যা ভাবে তা হয় না। কারণ Destiny has other plan। ওই ঘর থেকে কোন পোড়া দেহ পাওয়া যায়নি। যদিও ঘরে বেশিরভাগ বস্তুই আধপোড়া, তবুও স্পষ্টই বোঝা যায়, আগুন লাগার আগেই ঘরে থাকা কিশোরী মেয়েটি চলে যায় অন্য কোথাও। এমন দ্বন্দ্ব একটা নয়, দু-দুটো—

এক, মেয়েটি কোথায় গেছে?

দুই, ঘরে আগুন কি করে লেগেছে?

সকাল দশটা, থানায় এসে জড়ো হয়েছে অগ্নিদগ্ধ বাড়ির দ্রব্যাদি। কিছু সন্ধান পাওয়ার আশায় ইন্সপেক্টর চৌধুরি ভালো করে তাদের অবস্থান সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই সময় একজন মহিলা ও একজন পুরুষ একসঙ্গে প্রবেশ করল।

— নমস্কার, আমরা কলির মামা-মামি।

— বসুন।

— আচ্ছা, কলির কোন খবর?

— না, আপাতত কলির কোন খবর আমরা পাইনি। তবে চেষ্টা করছি।

— ওর ঘর থেকে কিছু পাওয়া গেছে?

— ঘর থেকে পাওয়া বেশিরভাগই আধপোড়া, সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। তবে একটি লোহার সিন্দুক, ছোট পাওয়া গেছে তালা দেওয়া।

— সিন্দুকে কি আছে? (বোধহয় ওর মায়ের সোনার গহনা, ওই গয়না কিন্তু আমাদেরই প্রাপ্য, কারণ—ওর মা নেই আর ওই মেয়েটা কোথায় তাও তো...

— দেখুন সিন্দুকে কি আছে না আছে, আমি জানি না, তবে ওই সিন্দুক সম্পর্কিত তথ্য আপনারা কালকে সকালে পাবেন।

— আচ্ছা তাহলে কালকেই আসব, আসছি।

— আসুন।

এক ফুট বাই এক ফুট লোহার সিন্দুক, এত ছোট সে সিন্দুক না বলে বাক্স বললেও ক্ষতি নেই। তবে সিন্দুক খুলে দেখা গেল তার ভিতর আরও একটি ছোট কৌটো। এত সুন্দরভাবে সুরভিত দেখলে মনে হয় ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো। ইন্সপেক্টর চৌধুরিকে অবাক করে দিয়ে সেই কৌটো থেকে বেরিয়ে এল একটি কাগজ, কাগজ বলা ভুল চিঠি বললেই ভালো। সেই চিঠি লেখা থানাকে উদ্দেশ্য করেই। চিঠিটা নিম্নে দেওয়া হল—

মাননীয়,

পুলিশ

আমি কৃষ্ণকলি সেন, এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনার মনে বেশ কিছু প্রশ্নের উদয় হয়েছে আমাকে কেন্দ্র করে আর তার অবসানের জন্যই আমার এই পত্র লেখা।

আমি ছোটবেলা থেকেই মামাবাড়িতে বড়ো হয়েছি। তাই, আমি আমার পরিবার বলতে বুঝি মা, দিদা, মামা, মামি আর ভাই, আমাদের বাড়িতে আমরা সবাই রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। আমার মায়ের একটা পছন্দের কবিতার লাইন— 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি।? কালো মোরে বলে গাঁয়ের লোক"।

আর এই কবিতার লাইন থেকেই আমার নামের জন্ম। মায়ের কাছে শুনেছিলাম, আমার তিন মাস বয়সে মা আমাকে

নিয়ে মামাবাড়ি চলে আসে, আমার বাবা প্রায় প্রতিদিন মদ্যপ অবস্থায় এসে মায়ের ওপর অত্যাচার করত। শুনেছি, আমার আগে আরও তিনটেদিদি আমার ছিল, কিন্তু শুধুমাত্র কন্যাসন্তানের জন্য তাঁরা পৃথিবীর আলো দেখতে পায়নি। হয়তো আমিও পেতাম না। কারণ — আমাকে বাঁচানোর জন্যই আমার মাকে একটা চোখ দিতে হয়েছে।

আজ থেকে দশ মাস আগে আমার একজন প্রিয় মানুষ আমায় ছেড়ে চলে গেছে। আর তার দু-মাস পরে আমাকে একা রেখে চলে গেল আরও একজন। প্রথমজন আমার দিদা ও দ্বিতীয়জন আমার মা, আপনি বলতেই পারেন যে, আমি কেন নিজেকে একা বললাম। আমার মামা, মামি, ভাই আছে, ঠিকই আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম যে, আমি তো একা নই। কিন্তু না, আমারও ভুল ভাঙল যখন জানতে পারলাম, আমি একাই।

সেদিন কলেজে গেছিলাম ঠিকই কিন্তু কলেজ বন্ধ ছিল, তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। আর তখনই শুনতে পেলাম এক অভিসন্ধি। আমাকে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত। কারণ একটাই সম্পত্তি। আমার দিদা তাঁর পুরো সম্পত্তি সমান দু-ভাগে ভাগ করেন, তার সেই একভাগ সম্পত্তি হস্তগত করার জন্যই এই চক্রান্ত। এই চক্রান্তে সামিল আমার মামা, মামি ও ভাইও। এই মাকড়সার জাল থেকে নিজেকে ছিন্ন করার জন্যই আমার এই সিদ্ধান্ত।

আমি কুড়িটা বসন্ত পার করেছি। আমার মা তার নিজের চোখ দিয়ে আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমাকে এই পৃথিবীর রূপ দেখতে সহায়তা করেছে। তাই এই চোখকে এত সহজে আমি হারাতে চাইনি। আমি নতুনের সন্ধানে বেরিয়ে গেলাম, রবিঠাকুরের কথা স্মরণ করে ভগবানের কাছে আমার একটাই প্রার্থনা— ''আয় রে নূতন, আয়, সঙ্গে করে নিয়ে আয় / তোর সুখ, তোর হাসি-গান''

এতদূর পড়ে আপনি নিশ্চয় ভাবছেন, আমি তো আপনাকে এসেই বলতে পারতাম, এই চিঠির তো কোনো দরকার ছিল না, সেখানে হয়তো আমার ঝুঁকি ছিল, আর আমি বিশ্বাস করি, ...আরেকটা কথা আপনাকে ফোন আমিই করেছিলাম আগুন লাগার কথা জানাতে।

ইতি—
কলি

পরদিন সকাল দূরভাষ দূরের ভাষা নিয়ে হাজির তালবাগান থানায়। ইন্সপেক্টর চৌধুরী ফোন ধরতেই ফোনের ওপারে উৎকণ্ঠার সুর—

— আমি কলির মামা বলছি, আপনি বলেছিলেন আজকে সকালে ওই সিন্দুকে কি আছে দেখাবেন, আমরা কখন যাব?

— আপনাদেরকে আর আসতে হবে না।

— কেন? ওই সিন্দুকে যা পাওয়া যাবে তার উত্তরাধিকার তো আমরাই। কলি নেই, ওর মাও...

—আপনারা অবশ্যই কলির সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকার, তবে এটা জেনে রাখুন, আপনারা যা ভাবছেন, সিন্দুকে তা নেই তার বদলে আছে এক কিশলয়ের উত্তরণের গল্প।

— কিছু তো বুঝলাম না।

— বুঝতে পারবেন। কিছুক্ষণ পর আমি আপনাদের বাড়ি যাচ্ছি। রাখলাম।

যদিও থানা থেকে বেরল দুজন, ইন্সপেক্টর চৌধুরী ও একজন পুলিশ, কিন্তু দোতলা বাড়ি ঘুরে থানায় প্রবেশ করল পাঁচজন। আবারও ন্যায় অন্যায়কে পিছনে ফেলে সত্যের বিজয়কেতন ওড়াল পৃথিবীর অসীম আকাশে—

ঋণস্বীকার — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবিতা

লক্ষ্মী

পূজা দাস

ঘরের লক্ষ্মীকে মারছ পোড়াচ্ছ,
পথের লক্ষ্মীকে গণধর্ষণ।
গর্ভের লক্ষ্মী ভ্রূণহত্যায়
পথের লক্ষ্মীতে ফুলবর্ষণ।।

একটি মেয়ে

একটি মেয়ে, যার ছোটোবেলা থেকেই
মুখে ফুটে ওঠে ভাষা।
যার ছোটোবেলা থেকেই গড়ে ওঠে,
মনে ছোটো ছোটো স্বপ্ন পূরণ করার আশা।
যার, ঠোঁটের চোট্ট মিষ্টি হাসিতে
পিতা-মাতার বুকে ফেটে পড়ে আনন্দের জোয়ার।
আর, বড়ো হলে যাকে নিয়ে
পিতা-মাতার চোখ দেখে নিত্য-নতুন স্বপ্ন।

কিন্তু,
সুরক্ষিত কি সেই আদরের মেয়ে,
এই সমাজেই
সেখানে, তাকে ঘিরে রয়েছে,
সমাজে হয় কিছু নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী মানুষ।
যাদের, জন্য মেয়েরা সুষ্ঠু ও সংরক্ষিত ভাবে
পথে চলাচল করতে পারে না।
কারা, সেই অসভ্য ও লম্পট লোকজন,
যাদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়ই বরং
মানুষ বলেও মনে করা যায় না।
টেনে ছিঁড়ে ফেলো তাদের মুখোশ
যারা এই সভ্য, ভদ্র মুখোশের পেছনে
লুকিয়ে রেখেছে নিজেদের
অমানবিক চেহারা।
যারা, নিজেদের স্বার্থে,
মেয়েদের মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে
তাদের কী অধিকার আছে,
সমাজে মুখ দেখানোর
তারা কী যোগ্য
সমাজে মুখ তুলে বাঁচার।
শুধুমাত্র
ভগবান কী পারবে তাদেরকে
সৎ পথে ঠেলে দিতে
জানি না...

বিচ্ছিন্নতা

যদি প্রজাপতি হয়ে উড়ে গিয়ে
শোভা বাড়াবে বাগানের
তাহলে শুয়োপোকা হয়ে প্রথমে
হাতে ফুটলে কেন??
যদি ঝড়ে পড়ে যাবে একদিন
তাহলে পাতা হয়ে আলোর সাথে
লুকোচুরি খেললে কেন??
যদি ঢেকে যাবে কালো মেঘে
তাহলে নীল হয়ে সূর্যের সাথে
প্রেমে আবদ্ধ হও কেন??
যদি কারুর কাছে বেঁচে থাকার দায় হয়ে যাও,
তাহলে তাকে জন্ম দিয়েছিলে কেন??
যদি কারুর বুক মরূভূমি করে দাও তাহলে তাকে
নদীর শোভা কেন দেখিয়ে ছিলে??
যদি কারুর চোখে অবিশ্রান্ত ধারা দাও,
তাহলে তাকে হাসির ধারণা কেন দিয়েছিল?
যদি কারুর জীবনে ঝড়ের পাল তোলা,
তাহলে তার জীবনে শান্ত সমুদ্রের
শোভা কেন দেখিয়েছিল??
যদি ছেড়ে চলে যাবে একদিন
তাহলে কাছে কেন এসেছিলে??

প্রযুক্তির চোখরাঙানীতে, অকালমৃত্যু কল্পনার

• • •

সুশ্রিতা মুখার্জী
শ্রেণি : তৃতীয় বর্ষ বিভাগ : সাংবাদিকতা বিভাগ
ক্রমিক সংখ্যা : এ. জি. ৫৩২

''জয় জয় দেবী চরাচর সারে...'' এই মন্ত্রটা শুনলেই, যেমন তাজা হয়ে যায় ছোটোবেলার সেই প্রথম হাতেখড়ির স্মৃতি ঠিক তেমনিই যে কখন এই জীবনটা যে গুটিসুটি পায়ে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে তার টের পাওয়া ভার। তারই মধ্যে যে মানুষ কখন তার এই ছোট্ট শৈশবকে পিছনে ফেলে বড়ো হয়ে ওঠে তা বোঝা মুশকিল। এসব তো গেল জীবনের মধুর স্মৃতি। কিন্তু বর্তমানে কখন এই রমরমিয়ে বেড়ে চলা প্রযুক্তির আনাগোনা এবং চারিদিকের চরম প্রতিযোগিতাময় মনোভাব ও ব্যস্ততার পরিবেশই যে কেড়ে নিচ্ছে মানুষের কাছ থেকে তাদের কল্পনা ও শৈশব, তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। কথায় আছে না ''লোহা গরম থাকতে থাকতে হাতুড়ি মারা উচিত...'' ঠিক তেমনই সাম্প্রতিককালে হাতে গরম, Smartphone, নতুন app-এর রমরমা বাজারে সেই হাতে লেখার আর ছবি আঁকার অভ্যাসটাই যে ধীরে ধীরে মানুষের মস্তিষ্কের ধুলো পড়া অংশে জমা স্মৃতিগুলোর, মতোন হয়ে যাচ্ছে তাতে কোনো Touch তেই যখন কাউকে মেসেজ করা, text কার বা কোনো অফিসের কাজের দরকারি File পাঠানোর মতো তাবড় কাজগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে প্রযুক্তি বিপ্লবের বাহুল্যে যে, বহুকাল আগেই চিঠি হার মেনেছে text এর কাছে, আর হাতে আঁকা ছবি যে হার মেনেছে Editing app-এর কাছে তা প্রায় এখনকার একটা ছোট্টো বাচ্চাও জানে। যার ফলে আজকাল মানুষ তাদের ফর্দ লেখা, হিসাব কষা এমনকী ডায়েরি লেখার সব দায়িত্বই প্রায় ছেড়ে দিয়েছে তাদের প্রিয় Smart phone-এর ওপর এরকম ঘটতে থাকলে যে, অচিরেই পড়বে না হাতেখড়ির ধরানোর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটা ঠিক যে হাতেলেখার চেয়ে texting অনেক সহজ, আর তার চেয়ে সহজ যেকোনো creative art কে বা শিল্পকে editing করে আরো নিখুঁত করা। তাছাড়া texting-এর ক্ষেত্রে যেমন মাথা ঘামানোর বদলে জায়গা করে নিয়েছে তার শব্দ কোষমালা বা ইংরাজীতে যাকে বলে dictionary optionটা, তেমনি যে কোনা ছবির নগণ্য খুঁতকেও ম্যাজিক করে গায়েব করে দেয় Editing app, ভয় থাকে না কোনো খুঁতের। কিন্তু বর্তমানে এই সবকিছুর নিখুঁত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার পিছনে যেন একটা ভীত কিন্তু সর্বক্ষণ ঘটেই চলেছে, সেদিকে থেকে বলতে গেলে, মনোবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মতে, হাতের লেখা ও ছবি আঁকার অভ্যাস যে, মানুষের কল্পনাশক্তিকে উজ্জীবিত রাখে তা যা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই অতিরিক্ত যান্ত্রিকতা মানুষকে বা তার ছবিগুলোকে নিখুঁত ও তার কাজগুলোকে সহজ করে দিলেও এটা যে আমাদের কল্পনার অলিগলিতে বিচরণের পথ রুদ্ধ করেছে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। তাই আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা পারদর্শী হয়ে উঠব ঠিকই, কিন্তু রবিঠাকুরের মতো, আর কারুর আঙ্গুলের সরণে আর সেরকম শব্দমালার ঝড় ওঠার সম্ভাবনা নেই, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। তাই মাঝে মাঝে নয় সবসময়েই আমাদের মধ্যে শৈশবকে উজ্জীবিত রাখতে হলে, ভালোবেসে যেমন পেন, তুলি, খাতা নিয়ে বসে পড়া যায় ঠিক তেমনিই এর মধ্যে এই চিন্তাও আনা যায় যে, আমাদের ভবিষ্যত হোক শুধু প্রযুক্তির মধ্যে নয়, পরিবর্তিত হোক এক নতুন বাস্তবময় কল্পনার রাজ্যে। ঠিক যেন, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মতের মতো, সেখানে তার মত হল, 'A genius is not made by the I. Q. they are actually good in imagination.'

‘পাই নে তোমারে’

• • •

দেবিকা সাহা

শ্রেণি : প্রথম বর্ষ বিভাগ : সাংবাদিকতা বিভাগ

ক্রমিক সংখ্যা :

পরম ব্রহ্মকে পাওয়ার জন্য মানুষ তাঁর উপাসনা বহু বছর ধরেই করে আছে, কে এই পরম ব্রহ্ম! তাঁর অবস্থানই বা কোথায়। তাঁর রূপ — গন্ধ — মাধুর্য কিরকম! এই সব কথার বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রমাণ না থাকার দরুন তা অন্তহীন তর্কের মেয়াদ জোগায়। ব্রহ্মবাদী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পূজা পর্যায়ের সঙ্গীত বিভাগে এরকমই অনেক গানের জন্ম দিয়েছেন যাতে, তার হৃদয়ের বোবা আর্তনাদ প্রকাশ পায়, ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে বিরাজমান — তাঁকে বাহ্যিক স্পর্শে পাওয়া না গেলেও অন্তরের তীব্র অনুভূতিতে সে ধরা দেয়। তাঁর পূজা পর্যায়ের এরকমই একটি গান হল — ‘দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে, আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে’। কবির এই গান ঈশ্বরের কাছে পৌঁছলেও তিনি তাঁর হৃদয়ে তাকে অধিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ।

মানুষের রূপটানের ন্যায় ভেতরের টানও নিয়ত পরিবর্তনশীল। কবিগুরু ও তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময়ে নানা পথের পথিক। মানুষ একদিকে মৃত্যুর ও অপরদিকে অমৃতের অধিকারী, একদিকে সে আত্মতুষ্টিতে বিরত ও অপরদিকে সে জনমানবের কল্যাণে সর্বদা ব্যস্ত। আমরা কোনোটাকেই উপেক্ষা করে চলতে পারব না।

রবীন্দ্রনাথকে ঈশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত করে, হল ভাড়া করে, মালা চড়িয়ে তাঁর গলায়, মাইক বাজিয়ে আমরা তাঁর যে জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন উৎযাপন করি তা কেবলই আত্মতুষ্টির বশবর্তী হয়ে পূজার্চনা, উপাচার, বন্দনা সর্বস্ব আমাদের অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে পৌঁছানোর থেকে বিরত রাখে। অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে দাঁড়ায় আমাদের এই বিপুল আয়োজন, আমরা আত্মতুষ্টিতে ভুগছি। উপাচার ও উপকরণের ভারে চাপা পড়ে যায় মনুষ্যজাতির আবেগ।

কবি বিশ্বাস করতেন, সৃষ্টির কোনো মৃত্যু নেই, তার কোনো জরা নেই, কোনো ব্যাধি নেই, কোনো ধ্বংস নেই, কবির ‘বেলা যায়, গানের সুরে জাল বুনিয়ে।’ যে মানুষ ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে এগিয়ে চলতে পিছপা হয় তাকে আমরা জীবন বিমুখ ও পলাতকই মানি। বড়ো হবার সাথে সাথে হাতে পেলাম ‘গোরা’। গোরা-র জীবনদর্শ আমাকে মুগ্ধ করল। ধীরে ধীরে পরিচিত হতে থাকলাম কবির ভয় না পাওয়া চরিত্রগুলির সঙ্গে। আলাপ হল ‘শেষের কবিতা’ এর ‘অমিত-এর সঙ্গে। যে প্রেম ও ভালোবাসার পৃথক দুই রাজ্যে বসবাস করে, প্রেমকে আশ্রয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এবং ভালোবাসাকে কেবল হৃদয়ে সাধনার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে জানে। কবি বোঝাতে চাইলেন — ‘ঝড়কে আমি করব মিতে, ডরব না তার ভুকুটিতে।’

কবির অনুভূতিতে কড়া নেড়েছিল শিক্ষার অন্ধকার। কবি অনুভব ককরেছিলেন যে পল্লীর উন্নয়ন করতে গেলে জাত-পাতকে বিচারমুক্ত করতে হবে এবং সর্বোপরি সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলো বিলিয়ে দিতে হবে। একমাত্র তবেই গ্রামের দরিদ্র প্রজাদের মনের অজ্ঞতা দূর করা সম্ভব। তিনি বুঝেছিলেন হৃদয় দিয়েই হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করা সম্ভব। ‘শান্তি নিকেতন’-এ ছোট্ট জায়গায় নিজের ক্ষমতার মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করে শুরু করলেন তিনি। ভারতবর্ষ পিছিয়ে থাকার মূল কাণ্ডারী হল শিক্ষা। কবি অনুভব করেন যে, শুধু শহরে নাগরিকতাকেই শিক্ষিত করে বিদেশীয়ানার স্পর্শ দিলে চলবে না, নিরক্ষর গ্রামকেও শিক্ষিত করে তুলতে হবে। নইলে সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব নয়। কবির এই নীরব

শিক্ষা আন্দোলনের সময় কোনো সরকারি বিদ্যালয় ছিল না বললেই চলে। তাঁর এই নীরব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা লাভ করে শক্তি সঞ্চয় করা। কারণ শিক্ষাই সকল শক্তির মূল চালিকাশক্তি। কবি বিশ্বাস করতেন, দেশে কতগুলি রেল লাইন স্থাপন করা হল, কতগুলি টেলিগ্রাম বসানো হল তা কখনোই দেশের গৌরব হতে পারে না। এবং এর সঙ্গে দেশের শক্তির কতখানি সম্পর্ক তাই-ই বিচার্য।

এটা তো চিরকালীন ধ্রুব সত্য যে, দেশে রেল লাইনের সংখ্যা ও টেলিগ্রাফের সংখ্যা কখনোই সেই দেশের গৌরব নয়। এর সঙ্গে দেশের শক্তির কতখানি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে সেটাই হচ্ছে গৌরব। ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার তাগিদে বিদেশে পাড়ি দেবার সংখ্যা যত বাড়বে সেই দেশের গৌরবের মান তত বেশি, এই বস্তাপচা চিন্তা-ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে সমাজ যতদিন না অন্তরের শিক্ষাকে গুরুত্ব ভেবে ততদিন সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশ রুদ্ধ হয়েই থাকবে। বাড়িতে একটা Computer ও চারটে Smart phone শিক্ষার মাপকাঠি হতে পারে না। ওই Computer ও Smart phone এক উপাদান। শক্তির সাথে দেশের প্রযুক্তিগত শিক্ষা কতোটা জড়িয়ে তাই-ই শিক্ষার মাপকাঠি। মারামারি, হানাহানি, অস্ত্র সঞ্চয় করা বন্ধ করে অন্তরের প্রকৃত শিক্ষাকে সমস্ত অজ্ঞতার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

তাই কবির উদ্দেশ্যে বলি, আমি পাইনে তোমারে আমাদের প্রতিবার 'রবি' বার হলেও সেই কবিগুরু, সেই সৃষ্টি জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র সম্পূর্ণ আলোকে আমরা আজও গ্রহণ করতে পারিনি।

হে কবি, আমরা আজও তোমার ছবি সম্মুখে রেখে অনুষ্ঠান করি শুধুমাত্রই আমাদের ভীরুতা, অজ্ঞতাকে ভুলে থাকার জন্য। আড়ম্বর প্রিয় বাঙালী তথা ভারতবাসী প্রতি বছর তোমার জন্মদিন ও মৃত্যুদিন পালন করে এবং এই প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয় যে কে কতো ভাল করে অনুষ্ঠান করে নিজেদের ভীরুতা ও কলঙ্কতার ইতিহাসকে চাপা দিয়ে রাখবে। অন্তরের অন্ধকার যে আজও ঘুচল না। তাই কবিগুরু তোমার উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করি—

''আমার জ্বলেনি আলো অন্ধকারে
দাও না সাড়া কি তাই বারে বারে...''

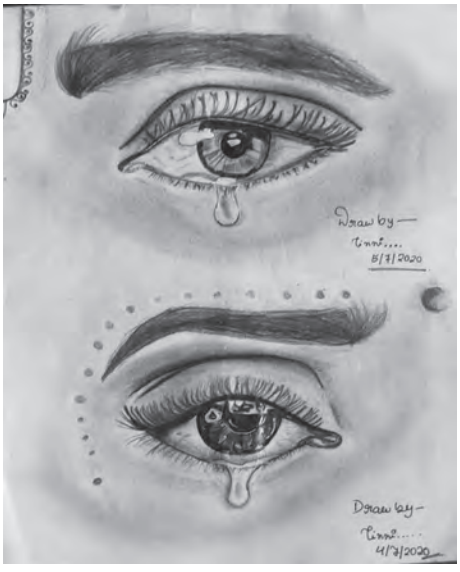

অলিভা পাল, প্রথম সেমিস্টার

যান্ত্রিক শৈশব

• • •

দেবরূপা ঘোষ
শ্রেণি : প্রথম বর্ষ বিভাগ : ইংরাজি (সাম্মানিক), সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম বিভাগ (সাধারণ)
ক্রমিক সংখ্যা : ৮৩

''যন্ত্র দিয়েছে বেগ,
কেড়েছে আবেগ।''

এই কথাগুলি কোনো এক কবির অলস কল্পনা নয়, আজকাল আমি, আপনি সকলেই ওই অভিজ্ঞতার শরিক। শিশুরা ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। কোনদিন পায়ে বল না ঠেলেই টিভি-র পর্দার ফুটবল খেলা দেখেই ওরা হাততালি দেয়। আমাদের শৈশবে মাঠে গিয়ে ছোটাছোটি করা, ঘুড়ি ওড়ানো, পাড়া জুড়ে লুকোচুরি খেলার কথা যখনই ভাবি, তখনই বর্তমান প্রজন্মের জন্য বড্ড মন খারাপ হয়। রাতে মা-ঠাকুরমার পাশে শুয়ে গল্প শোনার বায়না করতাম। পিঠে পুলিতে আজকাল শিশুদের অরুচি, পিজা-হট ডগই ওদের রসনার উল্লাস! ছোটবেলায় চড়ুইভাতি, বুড়ির ঘর পোড়ানো, হাডুডু-এক্কাদোক্কার পাশাপাশি পুতুলদের বিয়ে দেওয়া যেমন ছিল, তেমনই পাড়ায় প্যান্ডেল বেঁধে ঋতুরঙ্গ, শ্যামা-চিত্রাঙ্গদা, ২৫শে বৈশাখও ছিল। অথচ এতসব বাঁধ ভাঙা উচ্ছাসের মধ্যে দিয়েও বিশৃঙ্খল হতে লজ্জা পেতাম, পুজোর আগে শরতের সোনারোদ মাখা সাদা মেঘে ঘেরা ঝকঝকে নীল আকাশ দেখে, গলা ছেড়ে বন্ধুরাই সবাই মিলে গেয়ে উঠতাম, ''নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা।'' এতে কোনো লজ্জা ছিল না, ছিল এক অনাবিল আনন্দ! আর এখন দেখি কিশোর-কিশোরীরা সারাক্ষণ কানে দুটো তার গুঁজে মাথা ঝাঁকিয়ে চলেছে।

দোষ কি ওদের? নগরায়ন কেড়ে নিয়েছে ওদের সবুজ রাঙানো খেলার মাঠ নীল মুক্ত আকাশ। সেই মাঠে গড়ে উঠেছে বহুতল আবাসন বা শপিং মল। ব্রতচারীর প্রাণপুরুষ গুরুসদয় দত্ত, সব পেয়েছির আসর, স্বপন বুড়ো-র কথা ওরা জানে না, নামই শোনেনি কখনও। ওরা শোনে সলমন খান, দেব, আলিয়া ভাটের নাম। দেখে 'কপিল শো' বিগ বস এর অনুষ্ঠান। ওদের হাতে নেই ক্ষীরের পুতুল, অলিভার টুইস্ট, নেই সন্দেশ বা দেব সাহিত্য কুঠীরের মতো ছোটদের সাহিত্য পত্রিকা, তবে 'আছে' তালিকাও কম নয়, আছে 'মোবাইল' আছে 'কম্পিউটার', যন্ত্রে সুইচ টিপে একা একাই ওরা খেলে, হাসে, কাঁদে, ওরা মস্তিষ্কে ধরে রাখে না কিছুই, দরকার পড়লেই যন্ত্রে চোখ রাখে, 'গুগল সার্চ করে, আসলে চটজলদি তথ্য সরবরাহ করতে যে এটার মতো কেউ পারে না! তাহলে ওরা মাথা খাটাবেই বা কেন? বইই বা পড়বে কেন। সবাই তো 'মাম্মি ভুখ ল্যাগি হ্যায়-২ মিনিট্স এর বিজ্ঞাপনের মতো।

চোখের সামনে আস্তে আস্তে সমাজ কেন বদলে গেল! সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরাও হয়ে উঠল যন্ত্রনির্ভর। প্রশ্ন জাগে—দায়ী কে? দোষ কি আমাদের সমাজের? আমরাই কি পারলাম না আমাদের দায়িত্ব সামলাতে? সময় থাকতে কেন তুলে দিলাম না ওদের হাতে 'ঠাকুমার ঝুলি' লাটাইর সুতোতে মাঞ্জা দেওয়ার রসদ? উচিত ছিল না কি? আমাদের ভালোলাগার ভালোবাসার সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে এখন তো দেশ পরাধীন নয়, সেই ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মধ্য রাতে শপথ নিয়েছিলাম আমরা সুস্থ সমাজ গড়ার। আসুন আমরা সকলেই একটু চেষ্টা করি — এই কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা মুছে ফেলে মুক্ত ছন্দের প্রাণের শৈশব ফিরিয়ে দিতে। 'মুঠোফোনে' ব্যস্ত না থেকে একটু সময় দিই ওদের সঙ্গে, গল্প করি।

আমরা সকলেই একটি ভাবি — রবিঠাকুর তো বলেইছেন ''ভাবনার জন্যই ভাবনা করতে হয়।''

আধুনিকতা

• • •

কৌশিকী মুখার্জী

শ্রেণি : প্রথম বর্ষ বিভাগ : ইংরাজি (সাম্মানিক), সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম বিভাগ (সাধারণ)

ক্রমিক সংখ্যা :

''ইশশ তুমি কত অর্থোডক্স, পারলে একটু মডার্ন হও। এই রকম কথা এখন প্রায়শই শোনা যায়, কখনো অন্যের মুখ দিয়ে আবার কখনো নিজের মুখে, আমাদের কাছে আধুনিকতা মানে কি? কোথাও আমি এর সঠিক সংজ্ঞার্থ পড়িনি, পায়নি। তাই নিজে নিজে একা সংজ্ঞা তৈরি করে নিয়েছিলাম এবং সেটাই ছিল আমার কাছে যথেষ্ট। তাই কখনও কোল্লাও খুঁজতে যাইনি। কিন্তু আজ আমি যখন দেখি আমার চারপাশের মানুষরা কি বলছে বা কি করছে এই আধুনিকতা নিয়ে। কিছুটা হলেও আমি চুপ করে যাই।

বিশ্বে 'আধুনিকতা' ধারণার প্রথম উদ্ভব ঘটায় ইউরোপিয়ানরা। ঊনিশ শতকের শুরুর দিকে ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে, এ ধারনা সর্ব স্তরের একটি শক্ত ভিত গড়ে বসে। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে আধুনিকতার ধারনা সার্বজননীতা লাভ করে। আর সেই ইউরোপীয়দের আধুনিকতার ধারণা আমরা এখন লুফে নিচ্ছি সাড়ম্বরে। এখন মানুষের জীবনে আধুনিকতা একটি বড় বিষয়। টিকে থাকতে হলে যেন আধুনিক হতেই হবে। আধুনিকতা ধারণাকে আমরা মেনে নিয়েছি কোন প্রকার বাছ বিচার ছাড়াই। আমাদের দেশে আধুনিকতা মানে হল, ইউরোপীয়দের অনুকরণ, অনুসরণ। তাদের সংস্কৃতি, ফ্যাশন, স্টাইল, এবং যে কোন বিষয়ের উপায় উপকরণ ইত্যাদি হুবহু অনুকরণ, সেই অনুকরণ সব দিক থেকেই। খাবার থেকে শুরু করে চলা-বলা-কলা-শিক্ষা-সাহিত্য প্রতি ক্ষেত্রেই।

আধুনিকতা ছাড়া কি মানুষের ট্রাডিশন বলে কিছু নেই? রাতারাতি বদলায় না আমরা সে যতোই আধুনিক হই, তেমন চাওয়াটাও অন্যায়। তবে আধুনিক হওয়ার চেষ্টা নিশ্চয়ই করবো। তবে দু-চারটে আধুনিক কবির 'ক্রেজে' পড়ে যদি আমার গর্ব আমার অহংকার রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, মধুসূদনকে ভুলে যেতে হয় সে সাহিত্য আমরা চাই না। আধুনিক হবো বলে প্রতিদিনই কি ফাস্টফুড খাবো? ডালভাত ভুলে যাবো, ভুলে থাকতে পারবো কি? আজ পরস্পর বিরোধী মানসিকতা এই আধুনিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য দায়ী। আধুনিক ও উত্তরাধুনিকতার ধারনা সবচেয়ে বেশি আঘাত হেনেছে আমাদের সাংস্কৃতিতে। এ ধারণা আমাদের সংস্কৃতিকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে বললে ভুল হবে না তাই আজ আধুনিক বাঙালি বাবু আর বিলাতী সাহেবের তফাৎ খুব একটা বেশি নয়। এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে আমরা আধুনিকতার সঠিক ব্যবহার করতে সমর্থ হইনি এবং নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখতেও ব্যর্থ হয়েছি। আধুনিকতার ধারণাকে ব্যবহার করে আমরা আলাদা এক প্রকার ''ঢং'' তৈরি করতে পারতাম। অথচ ইউরোপের জীবনধারা, পোশাক, সাংস্কৃতি ও শিল্প দিয়ে আমরা নিজেদেরকেই নিজেরাই ঢেকে দিয়েছি। ফল হয়েছেও তেমনই। ভেড়ার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে কুকুরের ডাক। অথবা দেখতে কুকুর কিন্তু কাজ করছে ভেড়ার। আধুনিকতার ধারণা নতুনভাবে আমাদের মানবিকতার উপর আঘাত হেনেছে। পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ ক্ষুণ্ণ করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তো শ্রেণী বৈষম্যরও জন্ম দিয়েছে। জাতীয় জীবনে শহুরে এবং গ্রামীণ মানুষ সরল সময়ের সাথে বেমানান। আবার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীভাবে শহুরে মানুষ অত্যাধুনিক এবং কপট স্বভাবের। আজ সত্যিই ইউরোপীয়রা আধুনিকতার নামে আমাদের নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি মেমোরিচ্যুত করেছে। বীজবপন করেছে তাদের

সভ্যতা-সংস্কৃতির। আর আমরা স্বকীয়তা হারিয়ে দেওলিয়ার জীবনযাপন করছি। নিজেও আধুনিক স্টাইলে লিখতে চেষ্টা করি তবু ট্র্যাডিশনকে কোনভাবেই পাশ কাটাতে পারি না, পারবোও না। কারণ গায়ের গন্ধের মতই ওটা যে আমার জীবনে মিশে আছে। ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করলেই কি কাক রাতারাতি ময়ূর হয়ে উঠতে পারে? যে শিল্প গণমানুষের কাছে দুর্বোধ্য সে শিল্প যত দামীই হোক তা তেমন আবেদন কিংবা অবদান রাখতে পারে না। তা অচীরেই নতুন আধুনিকতার কাছে পুরানো হয়ে যাবে নিশ্চিত। তবে এই সো-কল্ড আধুনিকতা থেকে পরিত্রাণের কি কোন পথ আছে? কে জানে? হয়ত আছে, হয়তো নেই।

দীপশিখা রায়, প্রথম সেমিস্টার

দীপশিখা রায়, প্রথম সেমিস্টার

हिन्दी कविता

नीतू कुमारी

दबा रह गया...

दावात गिरा...
बिखर गया ...
मानों लेखनी,
की नीवं टूट गई

पन्ने कोहरा रह गया
न उमंग की किरण
न खुशी की लहर

प्रेम प्रसंग न लिख पाया
मन की दबी बात
दबी रह गयी...

गुजरी कहानी

आज बादलों में
मन चला
विचरण करने

हमें जानने...
समझने...
ताड़ने

देखने में
बर्फ की मीनार
धूने से मानों,
रुई का फाह

बचपन की गुर्जी
कहानी याद आती
किताबों की पन्नों वाली
बादल फटा, बर्ष बना
बरस पड़ता

कागज की कस्ती बनाना
कीचड़ से दोस्ती
बादल से गुजारिश
बारिश की चाह।

Article on Child Labour

Shalini Dutta

B.A., 1st Year English Honours, Roll 163

Not all children in India are lucky to enjoy their childhood. Many of them are forced to work under inhuman condition. A large number of children in India are quite strangers to the joy and innocence of the formative years of their lives. They are exploited under hazardous work condition, poorly paid for long hours of work; they have to abandon their studies to support their families at an age child early labourers also run the risk of contracting various diseases. They are vulnerable to exploitation by all means.

Children often work in dangerously polluted factories. They work for 9 to 10 hours at a stretch including night shifts. No wonder that a large number of child workers have sunken chests and their bone frames just out giving them a fragile look. They are made to work in small rooms under inhuman conditions which include unhygienic surroundings.

Child labour is inevitable in a country like India where 40 percent of the population lives in conditions of extreme poverty. The children have to supplement their parent's income or in some cases, they are the only wage earners in the family.Sometimes children are employed against a loan or debt or social obligation by the family of the child. In urban areas children of migrant workers mostly belonging to low caste groups such as dalits or marginalised tribal sections are pledged to work in small production houses and factorics.

Collective efforts are needed on the part of our society and the government to put an end to the practice of child labour. The government should make efforts to in crease the incomes of parents by launching various development schemes. Efforts should be made towards poverty eradication combined with educational reforms to provide free or affordable access to quality education. Only by taking comprehensive steps the Government can hope to eliminate all forms of child labour by 2025.

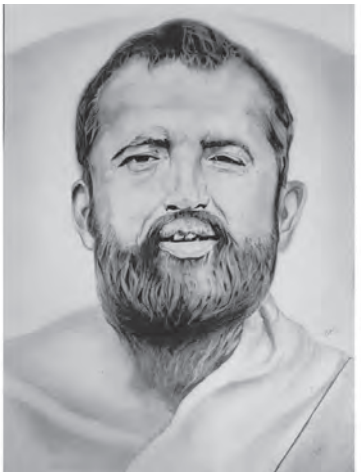

Anita Dhobi Third Semester

Article on Women Empowerment

Rajstuti Mitra
1st Year, English (Hons.) Roll No. - 156

"We realise the importance of our voice when we are silenced." —Malala Yousafzai

Women Empowerment implies the ability in women to take decisions with regard to their life and work and giving equal rights to them in all spheres like personal, social, economic, political, legal and so on.

Women empowerment is the much talked about issue today. Women are increasingly getting empowered to decide the course of their life and professions and realize their fullest potential :—

"I want to apologize to all the women
1 have called pretty,
before I have called them intelligent as brave
I am sorry I made it sound as though
before I've called them intelligent or brave something as simple as what you're born with
us all you have to be proud of
when you have broken mountains
with your wet.
From now on I will say things like
you are resilient, or you are extraordinary not because I don't think you're beautiful but
because I need you to known
you are more than that"

— By Rupi Kaur

Women empowerment has become the buzzword today with women working alongside men in all spheres. They profess an independent outlook whether they / their duties take discharge or decisions with regard to their education, career, profession and lifestyle. With steady increase in the number of working women, they have gained financial independence which has given them confidence to lead their own lives and build their own identity. They successfully take up diverse professions to prove that they are second to none in any respect. But while doing so women also take care to strike a balance between their commitment to their profession as well as their home and family. They are playing multiple roles of a mother, daughter, sister wife and working professional with remarkable harmony and case. With equal opportunities to work, they work to render all possible cooperation to their male counterparts in meeting the deadlines and targets set in their respective professions Women empowerment is not only limited to urban areas but also in remote towns and villages, are they increasingly making their voices heard loud and clear in society. They are no longer willing to play a second fiddle to

their male counter parts. Educated, they are asserting their social and political rights and making their presence felt regardless of their socio-economic back-grounds.

While it is true that women, by and large, don't face discrimination in society today, unfortunately many of them face exploitation and harassment which can be of diverse types-emotional, physical, mental and sexual. They are often subjected to rape, abuse and other forms of physical violence.

Women empowerment adds to confidence of women and their ability to lead meaningful and purposeful lives. It removes their dependence on others and makes them individuals leading lives on their own right. With it, we cannot remove injustice and gender bias and inequalities.

Women empowerment helps to make the society and world a better place to live in and march forward on our way to inclusive participation. It means increasing happiness for the family and the organizations where women make a difference. Unless there is attitudinal change in society towards women, merely arming then with legal and constitutional rights will be simply inadequate.

Meghna Jaiswal, First Semester

Trisha Roy, First Semester

Imagination And Literature

Sayantika Mukherjee
1st Year, English (Hons.)
Roll No. - 97

The exaltation of imagination as the prime agent of creative process, comes with the German critics and the Romantic poets of the nineteenth century. Blake writes : "Imagination is spiritual sensation." It is the "first principal of knowledge and all others are derivative". In his reaction against empiricism and theories of art based thereon, Blake condemns all those who pretend to destroy imagination by imitation of nature's images drawn from remembrance. Blake reverses the assumptions of the empirical tradition without the aid of German metaphysics.

Coleridge distinguishes two types of imagination — the primary imagination and the secondary imagination According to him, the primary imagination is the living Power and prime agent of all human perception and the secondary imagination is an echo of the former, coexisting with the conscious will, yet as identical with the primary in its agency and differing only in degree and in the mode of operation, which dissolves in order to recreate or to idealise and to unify. It is thus sharply differentiated from fancy which is a mere mode of memory emancipated from the order of time and space. Coleridge seeks to unite creative imagination with the imitation of nature. Wordsworth rejects the differentiation between fancy and imagination, listing them together as one of the qualities requisite for the poet. Wordsworth distinguishes the human and dramatic imagination of Shakespeare from the enthusiastic and meditative imagination of the Bible, Milton and Spenser. The Romantics insist that the most vital activity of the mind is the imagination. They believe that imagination gains efflorescence into the transcendent world.

With this imagination, Wordsworth evokes upon common things a light that never was on sea and land thereby ascribing abeiota of divnily onto such things. Coleridge, on the other hand, can naturalise the supernatural with this imaginative insight into the spirit of the weird and the uncanny.

Wordsworth, again, makes imagination akin to intrusion which helps him to perceive the presence of something for more deeply inter fused. All the romantic poets have had perception of the world of senses but for them it is the instrument which set their visionary powers in action. The visible world is, for them, mirror of eternity.

John Keats is generally known as a poet who lived for sensuous impressions but sight, touch and smell awoke his imagination and he found himself transported to an ideal world of beauty love and joy. 'Ode to a Nightingale Keats' is an example of imaginative excursions to a higher reality through the operation of the senses. In Endymion, he says that happiness

raises our mind to the followhip with essence. Shelley believes in the creative power of imagination, In ***Prometheus Unbond,*** he says that a poet watches the natural things and from these he can create forms more real than living man. He calls poetry “The expression of imagination” because in it, diverse things are brought together in harmony instead of being separated through analysis.

Wordsworth and Coleridge expound the theory of imagination in their critical writings, Preface and ‘Biographia Litereria’ respectively Coleridge in his supernatural poems ‘Kubla Khan,’ ‘The Ancient Mariner’ and Christable conveys the mystery of life by obliterating the distinction between the natural and the supernatural. Wordsworth explains imagination as reason in her most exalted mood and by this imagination, he can see into the life of things.

Thus, the great romantics agree that their task is to find through imagination some transcendental world which explains the world of appearances. From the romantic perioly the role of imagination in poetry and literature is being stressed. The romantics derive their theory of imagination largely from metaphysics; But that literature is an imaginative reconstruction of facts of life, is admitted by critics and writers since then. In modern theories of poetry, we hear relatively little about imagination. The synthesis of different elements in a work of art is brought by imagination.

Whatever may be the aesthetic, psychological and philosophical interpretation of imagination, the fact remains that) imagination is a creative faculty which helps the creation of the beautiful forms out of the materials of life. Art is life seen through a temperament. It is an interpretation of life as life shapes itself in the mind of the interpreter. It is the vision and imagination of the writer that make for the uniqueness of a work of art. Again, imagination recreates and rediscovers life for the readers, it does not copy nature. It diffuses, dissolves and recreates; it idealises and unifies. Through imagination the particular becomes universal, and different formal elements become an organism.

Isha Chatterjee, Second Semester

Trisha Roy, First Semester

The Youth of Today is The Drawing Force of Tomorrow

Rajstuti Mitra
1st Year, English (Hons.) Roll No. - 156

Our modern generation is changing and everyone is busy blaming the youth of today.;
But few can we blame for the future when it was us who made the world this way.

Young people are crucial segment of they are the base for future development. Young people are social actors of change and can serve as pressure group of lobby goes in defining the priorities. It has been clearly stressed that youth are not only the lenders of tomorrow but the pathers of Today. Youth have some responsibility towards then country. We need to learn from yesterday and live with hope for a better tomorrow. We can learn from our past how the young warriors shed then blood for the country. We all have some duties towards or country which we must understand and practice. Youth and nation how to walk hand in hand. Mosa importantly the youth should be honest and hand working kg Youth should stand against all wrong doings in the country instead of blaming the system. We the youth should use our brains strength creativity and imagination to serve our nation instead of asking who's going to fight the corruption? We should do it ourselves, rather than fighting upon the issues and running the country, we should learn to develop it salute all those youths of the past who made an effort to make a difference We are back bone to the nation and can change the future of the society with our well being and consariguireous behaviour.

Unfortunately we find today the youth, those who are more interested in other places which are not useful to them as well as to nation They choose to spend the days doing drugs and armed robbery, Mare and more young men and women of this age group are setting at home or roaming about aimlessly instead of bettering themselves or going to work. They have no vision and if they don't have dreams they don't have the drive to make and attempt at achieving them. We must get control of this. We must motivate our youth. We must teach responsibility and goal settings, things have to change, with our schools with the older generation being, mentors, and with the youth who are right now doing nothing. It is the duty of the youth to show the older generation that they are wrong about us. Let them show that they have intelligence and skills. You will not became rich overnight either way but at least if you make and effort then you have begun journey to your dreams.

The youth of today is the driving force of tomorrow. It has some responsibility towards its nation which it must acknowledge and practice. Youth should come together and mould the nation for a better tomorrow. If any section of the society in any country is most important for change, again in it the youth people. Patriotism comes naturally to young people but they also respond early to the call of Internationalism.

The youth compete with sporting spirit Just took at the spirit of Internationalism that today prevails in the soccer (football) world with the start of any football tournament no matters

which team wins, football youth fullness will spirit of oneness will win Black stars, satelite and others. Let's look at the team spirit of oneness they show in the field of play and try out things. And they were alive and powerful. So let's look around and listen to the cry of Mother ghana which is unhead. Choose your role and act appropriately to create better tomorrow and change the minds of the people.

Annual Sports, 2020-2021

Annual Sports, 2020-2021

Pendulum

Urmila Ganguly
1st Year, English (Hons.) Roll No. - SH 820

"Insanity Doing the same thing over and over again and expecting different results."
—Albert Einstein

Humanity is a submissive harmony of all the animal instincts that nature empowred human along with survival instincts. Later on civilization provided the opportunity to rethink the definitions of the qualities that made us human.

3 days had been passed but the sky was still not quite clear. Suddenly the phone beeped. Rii's mother received the phone calmly. Her teary voice assured that she couldn't make a She instructed her daughter to accept the reality and return home safely. The first thing she did returning home was to text Aakash "I lost, I couldn't clear the finals." Moments later the reply came... "Fight and just don't give up."

After a week, Rii went to college. Her friends waved, but she didn't respond. Everything seemed fake. She waited for Durga to come out of the Professors' Room. She avoided eye contact, but Durga noticed her.

Dogs Are you done with the formalities?

Rii: Yes.

Durga: You should definitely rejoin the classes. See, the past is behind you Now move on and make an effort.

After a brief pause, she spoke again. D: So should I expect you in the upcoming classes?

Rii nodded her voice cracked.

R: I requested Sarat sir if he could manage to guide me for the next few months before I appear in the finals.

D: I heard that but you should start planning your action right now.

A silence followed then Rii slowly looked up into her eyes waiting to be heard. She liked this teacher since the very first day of college. Durga asked, breaking the pause – "Want to say something?"

Words formed webs inside Rii's head but all she could manage to say was no.

The sky was finally clearing the freshness that the rain spread... all felt a bit slow. Rii decided to move forward. Sarat sir was going to resume the classes from that day. The college was going alright. Everything seemed to fall on place. Rii was distracted by the plea sure of the morning breeze. She was almost falling into the void going over and over again through the past... Aakash was there when she had needed him. He had comforted her when the packets of cigarettes failed Everyone had been hopeless of her. He was the one who had got her back to life. Rii had surrendered... she had fallen in love with him. It was alright at first. But she was too afraid that this wouldn't work as well. She was too vulnerable. She actually scared Aakash

away. Everything started to fail.

Rii: still wanted him back... she was unable to let go of his eyes, which, although, were indifferent while he had advised her to move on...

Rii: returned to consciousness, suddenly and thought to herself. Stop over thinking. She gathered her books fumed the pages and waited for Sarat sir to come. He was a weird person. He lived within his own world. He was Durga's friend. He tried to explain everything logically. He visualized the world from inside of some obnoxious boundaries and nothing in between The earth was a parallel superimposition of black and white for him.

Rii: was always a bit curious about him. She tned to know more about him but never succeeded. Sometimes he suffocated Rii with his harsh truths. But one thing Rii loved about him was his happiness, like a newborn baby. He was ageing like everyone, but never really grew old.

Days were passing by every week. Rii used to wait eagerly both for Sarat sir and his classes. They used to walk for hours after the class He tried to ex plain her wrong steps how she could be so vulnerable and accepted Aakash as a mental support and fell in love with him He sometimes even assured her - "Go find a subject that you like more than anybody else and live inside it. You'll be happier. And trust me you would never look back." ... and Rii nodded like a little girl She was finally able to sleep without tossing and turning for hours Aaksh was still occupying her mind She had let him control her happiness... and then it was gone with him That void had become inevitable Sarat Su could understand her dilemma. He told her "You cannot separate yourself in parts at a time and claim yourself happy".

It was Holi. Aakash was to come over He was here only color in the monotonous life. He disappointed Rii once again. She was hopeless. She called Sarat sir and asked him to meet. They met at the riverside. Rii drowned her feet and splashed water every now and then. The sun was slowly heading towards west leaving all its glory behind. She was silent today.

Sarat: Can you please start?!! The dusk feels too sad to me.

Rii: No, I'm perfectly saturated After a long pause Rii: looked at his eyes.

Sarat: What are you looking at?

Rii: Your eyes are beautiful!!

Sarat: Really? In a world of possibilities, you only get to look at my eyes?!!

R: Don't say that, say "I'm uncomfortable don't look at me".

S: Fine, I'm uncomfortable Look elsewhere if you please...

Rii: smiled and moved her eyes aside to follow the sindoor-red reflection of sun in the water.

R: Can I ask you something?

S: Goon

R: Please don't abandon me.

S: But why?

R: I don't know

S: What special things do we do that will be missed afterwards?

Rii: was silent. She mumbled something inaudibly. She cleared her throat.

R: May be can sleep in peace now because of you.

Sarat moved closer to her he lifted her hand and took it between his palms.

S: Who am I to you?
R: A friend
S: Sure?

Rii nodded Although she was clear that she wanted Aakash and not him She didn't want any next with him Besides she knew they had such complex age gap and social restrictions Still she was happy that somehow, he held her hand.

That night, some calculations went terribly wrong. She closed her eyes but she couldn't find Aakash's eyes. The vision was clearly disrupted. She saw Saral's eyes instead There was no escape!

The next day Durga somehow noticed that Rii was distracted. Rii wanted to share things with somebody Durga seemed the only one. She requested Durga to sort things out at their mutual convenience Rii was asked to be truthful over and over again, But she was too warned to be judged She was afraid to lose contact with someone such close. Durga asked Rii about her feeling towards him. Rii consciously lied She poured in all her insecurities about Sarat and her relationship into the denial of the newborn feelings about him And then she made up some excuses and escaped the scenario. Situations were going worse as usual. Sarat had also told Rii that those feelings of her were clearly not mutual. He showed her proper signs which were intentionally ignored.

Things started to fall apart again Durga had distanced herself from Rii. The whole thing was at dead end College seemed too mechanical after these. She realized that she was experiencing some tempered visionary of happiness. She talked to Sarat about apologizing to Durga but never found the courage. One day her 'guilty conscicous' made her apologize to Durga and she conveyed that she wanted things normal between them again. Durga agreed on one condition, she asked her to go on with the relationship with Sarat as friend not under some poor constant social boundaries that camouflaged under the name of love.

Three days have been passed but the sky is still not quite clear. Suddenly the phone beeped. Rii's mother received the phone calmly. A teary voice responded from the other side- "I made it maa..." The whole scenario fell like some sort of deja vu. Suddenly she felt weak on her knees and there was dark everywhere. When she opened her eyes she saw that Durga was holding her hands. She closed her eyes again. Then some calculations went terribly wrong. She closed her eyes but she couldn't find Sarat's eyes. The vision was clearly disrupted by the eyes of the lady sat beside her holding her hands. And again there is no escape...

Saraswati Puja Festival, 2020-2021

Creative Bower

Ila Mondal, First Semester

Disha Ghosh, First Semester

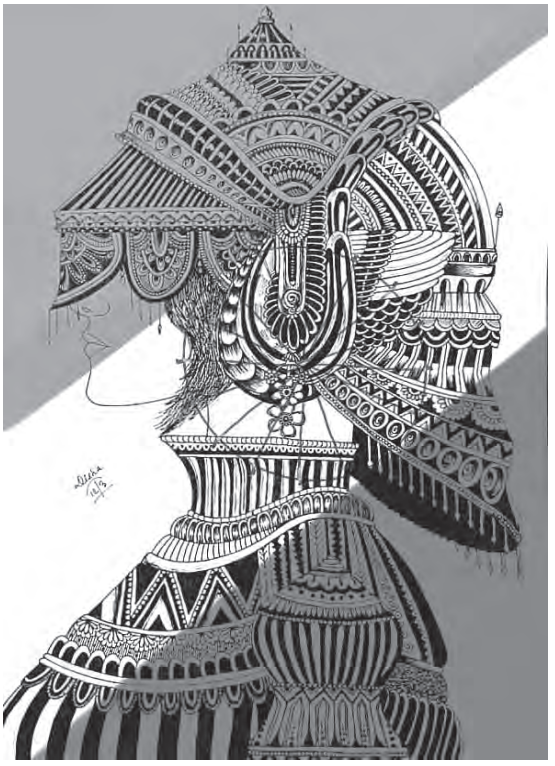

Mondal Digital

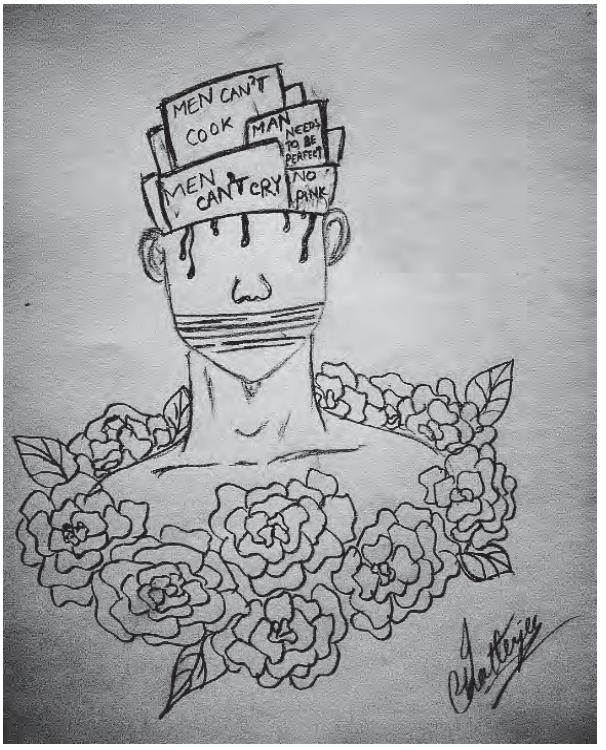

Isha Chatterjee, First Semester

Creative Bower

Isha Chatterjee, First Semester

Shreya Sadhukhan, First Semester

Trisha Roy, First Semester

Shreya Sadhukhan, First Semester

Supriti Deb, First Semester

Creative Bower

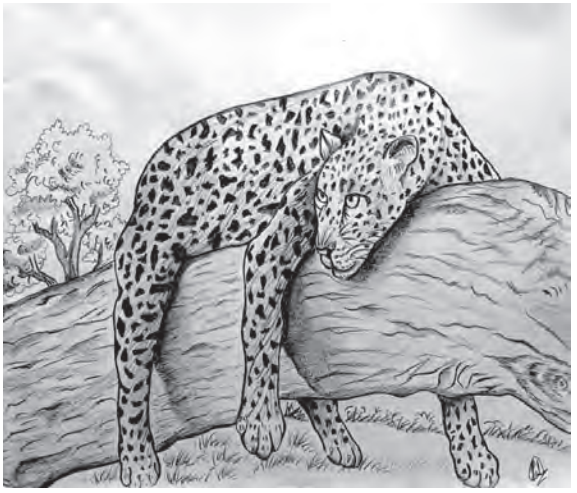

Pencil Sketch